তিন-চার-পাঁচ...

সুব্রত হালদার

আকাশটা ক্রমে গাঢ় নীল হয়ে গেল। মেঘগুলো কখন যে দূরে চলে গেল খেয়াল করিনি। দিগন্তরেখায় নিশ্চল সমুচ্ছ্রিত পর্বতমালা। তার ওপারে তিব্বত। সাদা মেঘের সান্তর আস্তরণের নীচে সবুজ গালিচা। একটানা ফুল-থ্রটল-এ ষোলো হাজার ফুট ওপরে এসে ইঞ্জিনের পাওয়ারটা কম করে দিলাম। এবার কিছুক্ষণ ভেসে বেড়ানো। নিয়মমাফিক উড়ানচর্চা। সঙ্গে তিব্বত-লাগোয়া বর্ডারের নজরদারি। নীচে আবছা হলেও দেখা যাচ্ছে ছিটকুল, মাংলা, রোপাঙ গ্রামগুলি। ওখানে কয়েক মাস গ্রাউন্ড ট্রেনিংয়ে কাটিয়েছি, এয়ারফোর্সে যোগ দেওয়ার প্রথম দিকটায়। আর কিছুক্ষণ মাত্র দেখা যাবে মনুষ্যলোক। তারপর জনমানবশূন্য গভীর জঙ্গল আর পর্বতমালা। এইভাবে আধঘণ্টা চক্কর কাটার পরে বেস-এ ফিরে যাব।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলল। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে। বল্গাহীন তীক্ষ্ণ রশ্মি চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ভাবলাম সানগ্লাসটা পরে নিই। নেওয়ার জন্য হাত বাড়াতেই চোখে পড়ল ড্যাশবোর্ডের এই বিশেষ অংশটা, যা দেখলে যে-কোনও পাইলটের শিড়দাঁড়া দিয়ে হিম স্রোত বয়ে যেতে বাধ্য। REFA লেখা লাল আলোটা দপ্-দপ্ করে জ্বলছে-নিভছে! রাইট ইঞ্জিন ফায়ার অ্যালার্ম। চকিতে পিছন ফিরে তাকালাম ইঞ্জিনের দিকে। আগুন দেখা যাচ্ছে না, তবে কালো ধোঁয়া বের হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলাম বেস-এ ফিরে যাওয়ার। ডানদিকের ইঞ্জিনটাকে নিউট্রাল করে দিয়ে একশো আশি ডিগ্রি টার্ন নিলাম। ঘন ঘন ইঞ্জিনটার দিকে তাকাচ্ছি এক ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কায়। ওয়ার্নিং লাইটটা দপদপ

করেই চলেছে। বারবার রিসেট টিপেও কোনও কাজ হচ্ছে না। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দুয়েকের মাথায় যেটা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হল। ডানদিকের ইঞ্জিন দিয়ে আগুন বের হতে শুরু করল। এক্সটিংগুইশার অন করে দিলাম। কাজ হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিমানের পিছন দিকটার পুরোটাই আগুনের কবলে চলে গেল। বেস-এ ফিরতে গেলে কমপক্ষে আরও কুড়ি-বাইশ মিনিট উড়তে হবে। সুতরাং পাইলটের শেষ কর্তব্যটাই করলাম। রিলিজ লক অ্যান্ড পুশ ইজেক্ট। মুহূর্তের মধ্যে মাথার ওপরে কাচের আচ্ছাদনটা পিছনে সরে গেল। সিট সমেত ছিটকে উঠে গেলাম প্রায় পঞ্চাশ ফুট। দেখলাম পাইলটহীন জ্বলন্ত বিমানটা দুরন্ত গতিতে সামনে ছুটে চলেছে। কিছুক্ষণের মধ্যে মেঘের রাজ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিড়ম্বনার চূড়ান্ত ক্ষণেও ভাগ্যদেবী নির্দয় হল না। দ্রুত গতিতে নীচে নামতে নামতে হঠাৎ কে যেন বলল, 'ভয় নেই রে আমি আছি।' পাইলট সিটের সঙ্গে লাগানো প্যারাশুটটা যথাসময়ে খুলে গেল। মাথার উপর বিশাল আচ্ছাদন যেন তারই আশীর্বাদক করতল। গতি শ্লথ হয়ে এল। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে নীচে নামছি। নীচে ঘন জঙ্গল। যতদূর চোখ যায় জনমানবের চিহ্নমাত্র নেই। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আছড়ে পড়ে ভবলীলা সাঙ্গ না হলেও সুস্থ শরীরে যে বেস-এ ফিরতে পারব তার নিশ্চয়তা কম। ক্যাপ্টেন মাথুরের কথা মনে পড়ল। ট্রেনিংয়ের সময় নানান উদাহরণ দিয়ে বলতেন যে, মানুষ এত বড় বড় বিপদ থেকে যেভাবে বেঁচে এসেছে তাতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করার আগে পর্যন্ত ধরে নিতে হবে বাঁচার সম্ভবনা একশো শতাংশ। মনে বল এল।

প্যারাশুটটা কন্ট্রোল করে একটা পাহাড়ি নদীর গা ঘেঁষে নামলাম। অন্ততপক্ষে তৃষ্ণার জলটা পাওয়া যাবে। তার সঙ্গে কোন দিকে যেতে হবে তার একটা আভাসও থাকবে। তবে আজ আর এগনো ঠিক হবে না। বড় বড় গাছগুলি সূর্যের শেষ আভাটাও ঢেকে দিয়েছে। আকাশে আলো থাকলেও মাটিতে অন্ধকার। ঠিক করলাম একটা গাছে চড়ে রাতটা কাটিয়ে দেব। কঠিন লড়াইয়ের জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। ক্র্যাশ করার সময় তাড়াহুড়োয় বেস ক্যাম্পের সঙ্গে যোগাযোগও করা যায়নি। বিমানটা খুঁজে বের করতেই হয়তো ওদের কয়েকদিন লেগে যাবে। তাতেও কোনও লাভ নেই কারণ বিমানটা হয়তো গিয়ে পড়েছে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে। এই ঘন জঙ্গলে দূরত্বটা অনেক। নদীর বরফঠান্ডা জলে হাতমুখ ধুলাম। পেট ভরে জলও খেলাম। ওটাই আজ রাতের একমাত্র আহার। একটা লম্বা অথচ সরু মতন পাইন গাছে চড়ে বসলাম। কোমরের বেল্টটা খুলে বেঁধে নিলাম একটা ডালের সঙ্গে। আস্তে আস্তে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল। তার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ কানে আসতে লাগল বিভিন্ন রাতজাগা পাখির ডাক। ঝিঁঝিঁপোকার ডাক। বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। বাবার কথা, মা'র কথা। ছোট বোন ঝুমার কথা। ওরা জানে না আমার এই অবস্থা। জানলে কষ্টে ওদের বুক ফেটে যেত। সে তুলনায় আমার কষ্ট তো কিছুই না। আগামীকাল ঝুমার মাধ্যমিকের রেজাল্ট বের হবে বলে জানিয়েছিল। নিশ্চয়ই খুব দুঃশ্চিন্তায় আছে। আজকে ফোন করে ওকে সাহস দিতে পারলে ভাল হত। নির্ঘাৎ সেই কথাটাই বলতাম। চিন্তা করিস না, আমি তো আছি। আবার ক্যাপ্টেন মাথুরের কথা মনে পড়ে গেল। ক্যাপ্টেন বলতেন, বড় বিপদের সময় শুধু নিজের কথা ভাববে। প্রিয়জনের কথা মনে করলে মনটা দুর্বল হয়ে যাবে। তাতে না তোমার লাভ, না তোমার প্রিয়জনের। মনটাকে শক্ত করলাম। কাল কী কী করণীয় সেটা ভাবাই ভাল। পারলে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়েও নিতে হবে।

অমাবস্যা হবে। আকাশে চাঁদ নেই কিন্তু তারায় ভরা। তারাও যে আলো ছড়ায়, তা এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। জঙ্গলে গাছের ফাঁকে ফাঁকে জোনাকির আলো জ্বলছে নিভছে। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডটা চঞ্চল হয়ে উঠল। জ্বলা-নেভা আলোগুলোর মাঝে একটা আলো মনে হল একনাগাড়ে জ্বলে আছে। তাহলে? নিশ্চয়ই কোনও মানুষ আছে। বারবার চোখ গিয়ে পড়ছে ওই আলোটার দিকে। সত্যিই ওটা জ্বলে আছে। এইভাবে কখন যে রাত পার হয়ে গেল, বুঝতেও পারলাম না। পুবের আকাশে আবছা লালের আভাস। ভোর ভোর গাছ থেকে নেমে পড়লাম। চলতে শুরু করলাম সেদিকে যেখানে আলোটা জ্বলছিল। প্রায় আধঘণ্টা জঙ্গল ভেঙে চলার পর দেখলাম একটা ছোট বাড়ি। পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে তৈরি। ওপরটাতে কাঠের দোচালা আচ্ছাদন। বেশ পাকাপোক্ত। বাড়ির চারদিকটায় বড় বড় গাছ থাকায় ওপর থেকে হয়তো দেখতে পারিনি। একটু এগোতে দেখলাম একটা নয়, দুটো বাড়ি। একই রকমের। তবে আলাদা আলাদা। সামনে গিয়ে কাউকে দেখলাম না। দুটো বাড়িতেই তালা বন্ধ। এককালে কেউ কি থাকত? এখন হয়তো আর থাকে না। যেটুকু আশা মনে জেগেছিল তা শঙ্কায় স্তিমিত হয়ে গেল। হঠাৎ পিছন থেকে একটা আওয়াজ কানে এল। পরিষ্কার দৃপ্ত উচ্চারণে কে যেন বলল, 'হু আর ইউ, ইয়ংম্যান?'

> এইবার খেয়াল করলাম ড্রয়ারটা এতটাই লম্বা ও বড় যে দুইজন লোক পাশাপাশি শুয়ে থাকতে পারে। ডক্টর পানের ইশারায় আমি ড্রয়ারটার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ডক্টর পান আমার শরীরটা কয়েকটা বেল্ট দিয়ে বেঁধে দিলেন।

পিছন ফিরতে দেখলাম একজন বৃদ্ধ [illegible] উচ্চতা ছ'ফুটের মতো। ফরসা মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি। নাইট সুটের মতো একটা পোশাক পরা [illegible] ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে ব্যাকব্রাশ করা লম্বা চুল [illegible] বৃদ্ধের দিকে ফিরে নিজের নাম বললাম। সঙ্গে এও [illegible] অবস্থায় যেটা প্রথমেই বলতে হয় বলে ক্যাপ্টেন মাথুর শিখিয়েছিলেন, 'আই হ্যাভ নট কাম টু ডু এনি হার্ম।'

বৃদ্ধ লোকটি এগিয়ে এলেন। একটু হেসে পিঠে হাত রেখে বললেন, 'আই অ্যাম নট অ্যাফ্রেড। কাম উইথ মি।'

উত্তরের ঘরটার দিকে এগিয়ে গেলেন।

ঘরটা বাইরের থেকে যতটা বড় লাগছিল, ভেতরে এসে ততটা বড় মনে হল না। তার একটা কারণ এই একটা ঘরের মধ্যেই ভদ্রলোকের থাকার সব ব্যবস্থা। বেড কাম কিচেন কাম স্টোর। ভদ্রলোক আমাকে অবাক করে দিয়ে পরিষ্কার বাংলায় প্রশ্ন করলেন, 'নাম শুনে তো বুঝলাম বঙ্গবাসী, পোশাক-আশাক দেখে তো বোঝা যাচ্ছে দেশরক্ষী। তা হঠাৎ এই জঙ্গলে কী করে?'

উত্তেজনায় আমি চিৎকার করে উঠলাম, 'আপনি বাঙালি!'

ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরে বললেন, 'যতদূর জানি ডিসিপ্লিন তো তোমাদের গোড়ার শিক্ষা। আগে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও, তারপর প্রশ্ন করো।'

ভদ্রলোকের চাউনিতে একটা সম্মোহনী শক্তি আছে। গতকাল বিকেল থেকে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো এক-এক করে বলে গেলাম। ভদ্রলোক সব শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'আমার নাম হরিপদ পান। বাংলা ভাষায় সবথেকে তাচ্ছিল্যপূর্ণ নাম, তাই না?'

কী উত্তর দেব ভাবতে ভাবতে ভদ্রলোক আবার কথা শুরু করলেন, 'ছোটবেলা কেটেছে বাংলাদেশেই, এক গণ্ডগ্রামে। তারপর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ঘুরে বেড়িয়েছি। কোথাও স্থিতু হতে পারিনি। শেষবেলাটা এই দুর্গম জঙ্গলে। অবশ্য এখানে আসার আগে দিল্লিতে ছিলাম বছর পাঁচেক।'

আমি প্রশ্ন করলাম, 'স্যর আপনি এখানে কেন? এখানে কী করছেন?'

—স্যর বলে সম্বোধনের কোনও দরকার নেই। তুমি আমাকে সায়েন্টিস্ট বলে ডাকতে পারো, কারণ আমি মনে করি সায়েন্টিস্টদের কোনও জাত, ধর্ম, বয়স থাকে না। তাদের একটাই পরিচয় যে তারা সায়েন্টিস্ট। একটাই পরিচয়, একটাই কাজ। নতুন কিছু করার, পৃথিবীকে নতুন কিছু দেওয়ার। তবে সায়েন্টিস্ট শব্দটা বড্ড খটমট। তুমি আমাকে ডক্টর পান বলেই ডাকবে।

—তার মানে আপনি সায়েন্টিস্ট। কিন্তু এই জঙ্গলে...

—জঙ্গলটাই হল রিসার্চ করার আদর্শ জায়গা। শুনে অবাক হচ্ছ? তোমাদের ওই ইট, কাঠ, ধুলো, ধোঁয়া, পলিটিক্স, টি এ, ডি এ, অ্যাকাউন্টস, অডিটে ভরা শহরে আর যাই হোক বিজ্ঞানের সাধনা সম্ভব নয়। বড় কিছু করতে হলে জঙ্গলই হল সবথেকে বড় ল্যাবরেটরি। জীবনভর পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলো

ঘুরেছি। আমার অভিজ্ঞতাকে তুমি ফ্যালনা বলতে পারো না।

—না, তা বলছি না। বলার অধিকারও আমার নেই। তবে এখানে কী রিসার্চ করছেন? গাছপালা নিয়ে কিছু?

—প্রাণ!

—প্রাণ?

—ঠিক তাই। আর বেশি দেরি নেই। সারা পৃথিবী দেখবে। বিজ্ঞানকে খুব কম করে হলেও দু'শো বছর এগিয়ে দেব।

কিছুই আমার বোধগম্য হচ্ছে না বলে ডক্টর পানের কথার মাঝেই প্রশ্ন করলাম, 'কিছুই বুঝতে পারছি না। একটু যদি বুঝিয়ে বলেন।'

ডক্টর পান আমার দিকে তাকালেন। আমাকে ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'কাল রাতে তো নিশ্চয়ই খাওয়ার কিছু জোটেনি। চল ব্রেকফাস্ট করে নিই।'

ব্যাপারটা সত্যি। কিন্তু ডক্টর পানের কথায় এতটাই মোহিত হয়ে পড়েছিলাম যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা টের পাইনি।

আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। তাই একটা স্বাভাবিক আগ্রহ হচ্ছে। খেতে খেতে ডক্টর পান বললেন, খাওয়া শেষ হলে স্নান করে নিতে। ঠিক ন'টায় ল্যাবরেটরিতে যাওয়া হবে। ওঁর বাথরুমে গিয়ে দেখি দিব্যি ব্যবস্থা। একটা পাইপ দিয়ে সারাদিন ঝরনার জল আসছে। ওঁরই একপ্রস্ত পোশাক পরে ল্যাবরেটরির সামনে এসে দাঁড়ালাম, দেখলাম দরজাটা খোলা। তার মানে ডক্টর পান ইতিমধ্যে প্রবেশ করেছেন। হাতঘড়িতে দেখলাম ন'টা পাঁচ। বেশ সঙ্কোচ হল। ভদ্রলোক যেমন ডিসিপ্লিন মেনে চলেন তাতে ডিফেন্সের যে-কোনও লোক লজ্জা পাবে। ঘরে ঢুকে দেখলাম ঘরটা বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। ঠিক মাঝখানে একটা টেবিল ও চেয়ার পাতা। ডক্টর পান চেয়ারটায় বসে একটা মোটা খাতায় কিছু লিখছেন। উনি ইশারায় আমাকে পাশে রাখা একটা টুলের ওপর বসতে নির্দেশ দিলেন। বসে চারদিকটা ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। এক দিকে একটা বড় দরজা যেটা একমাত্র প্রবেশদ্বার। ডান ও বাঁদিকের দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো লম্বা মতো দুটো টেবিল। টেবিল দুটোর ওপর অজস্র রকমের যন্ত্রপাতি। যন্ত্রপাতিগুলোর কয়েকটি চেনা কিন্তু বেশির ভাগই অচেনা। দরজার উল্টোদিকের পুরো দেওয়াল জুড়েই একটা বিরাট যন্ত্র। অনেকটা প্যানেলের মতো দেখতে। গায়ে অজস্র সুইচ, মিটার ইন্ডিকেটর। এতদিন বিমানের ড্যাশবোর্ডটাকেই জটিলতম মনে হত। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি সামনের যন্ত্রটার কাছে ড্যাশবোর্ড ভগ্নাংশ মাত্র। যন্ত্রটার গভীরতাও অনেক। কম করে আট-দশ ফুট তো হবেই। প্রায় মিনিট দশেক এক মনে লেখার পর ডক্টর পান মুখ তুললেন। চোখের চশমাটা টেবিলে নামিয়ে রেখে বললেন, 'কী লিখছিলাম জানো? কাল কী করেছি আর আজ কী করব। এইভাবে আমার আবিষ্কারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এই খাতাটায় ধরা আছে। কাল আমি যদি নাও থাকি, এই খাতাটাই বিজ্ঞানকে দু'শো বছর এগিয়ে দেবে।' খাতাটার ওপর সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বিজ্ঞানের মহাকাব্য।'

বললাম, 'আপনার আবিষ্কারটা আমাকে বুঝিয়ে বলবেন বলছিলেন।'

ডক্টর পান হাসতে হাসতে বললেন, 'বলব বলব, তবে কতটা বুঝতে পারবে তা তো জানি না। তাই গোড়া থেকেই শুরু করছি। আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাবে। উত্তর জানা না থাকলে সরাসরি বলবে যে জানো না।'

—ঠিক আছে। প্রশ্ন করুন।

—ফটো কপিয়ার মেশিন দেখেছ?

এত বড় বিজ্ঞানীর প্রথম প্রশ্নটাই যে এত সোজা হবে ভাবিনি। বললাম, 'হ্যাঁ জেরক্স।'

ডক্টর পান বললেন, 'হ্যাঁ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু পরেরটা ভুল। জেরক্স হল একটা কোম্পানির নাম, যারা ফটোকপিয়ার মেশিন বানানোর প্রথম পেটেন্ট পায়। লোক অজ্ঞতাবশত সব ফটোকপিয়ারকেই জেরক্স বলে। সুতরাং ভুলটা আগে সংশোধন করে দিলাম। কপি মেশিন মূল কাগজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের রং ও উজ্জ্বলতা জেনে নেয়, যাকে স্ক্যান করা বলে। তারপর আর একটা কাগজে সেই রংগুলি ও উজ্জ্বলতা সঠিক জায়গায় বসিয়ে দেয়, ব্যস। এক সঙ্গে যখন পুরোটা দেখছ তখন মনে হবে একই ছবি বা লেখা। এগুলো টু-ডাইমেনশনাল অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক। যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে। ধরো এমন একটা মেশিন বানানো গেল যেটা থ্রি-ডাইমেনশনাল কপি করতে পারে। অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা।'

হঠাৎ মনে পড়ল টিনটিনের বন্ধু প্রফেসর ক্যালকুলাসের কথা। উনি থ্রি-ডি কপিয়িং মেশিন আবিষ্কারের চেষ্টা করে রাস্তাপপোলাসের খপ্পড়ে পড়েছিলেন। সেটা আর ডক্টর পানকে বললাম না। উল্টে আগ্রহ দেখিয়ে বললাম, 'আর একটু বুঝিয়ে যদি বলেন।'

—বলছি বলছি, সব বুঝতে পারবে।

ডক্টর আমার হাতের অষ্টধাতুর আংটিটা চেয়ে নিলেন। ওটাকে হাতে নিয়ে বললেন, 'তোমার এই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বস্তুটা আমার কাজে লাগবে ব্যাপারটা বোঝাতে।' ওটাকে টেবিলে রেখে বললেন, 'ধরো এই আংটিটা একটা এক ইঞ্চি, বাই

এক ইঞ্চি, বাই এক ইঞ্চি ঘনক্ষেত্রের মধ্যে আছে। এখন এই ক্ষেত্রটার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশে ঠিক কী আছে সেটা যদি একটা যন্ত্রের মাধ্যমে অ্যানালিসিস করি তবে কী পাব? কোনও অংশে শুধুই বাতাস আর কোনও অংশে ওই আট ধাতুর একটি।'

—ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?

—গুড কোয়েশ্চেন। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলতে আমি বোঝাচ্ছি আণবিক স্তর। যেমন প্রিন্টার, ফটোকপিয়ারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বলতে বোঝায় এক ইঞ্চির কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষ ভাগের এক ভাগ। আমার যন্ত্রের ক্ষমতা আরও কয়েক লক্ষ গুণ বেশি।

—সে নয় হল, কিন্তু থ্রি-ডাইমেনশনাল অ্যানালিসিস কি সম্ভব?

—সম্ভব কী বলছ! এটা নতুন কিছু নয়। আজকাল অনেক মেডিক্যাল স্ক্যান-এ এটা তো হচ্ছেই। ক্যাড, ক্যাম-এ হচ্ছে। অনেক এয়ারপোর্টেও থ্রি-ডাইমেনশনাল ব্যাগেজ স্ক্যানও চালু হয়ে গিয়েছে। আমি শুধু সেটাকেই অ্যাডপ্ট করেছি, নতুন কিছু না। তবে একটা ব্যাপার আছে। স্ক্যানের ক্ষমতা নিয়ে গিয়েছি অ্যাটমিক লেভেলে। ন্যানো টেকনোলজি কী জানো?

আমি বললাম, 'কিছুটা জানি। ভবিষ্যতের বিজ্ঞান নাকি ন্যানো টেকনোলজির ওপর দাঁড়িয়ে। ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি সব কিছুরই নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। মেডিক্যাল সায়েন্সও নাকি আমূল বদলে যাবে ন্যানো টেকনোলজি অ্যাপ্লাই করে। এটাই বিজ্ঞানের সবথেকে আলোচ্য বিষয় আজকাল।'

—আজকাল!

ডক্টর পানের ঠোঁটে বাঁকা হাসি, 'অথচ আমি ন্যানোটেক নিয়ে কবে কাজ শুরু করি জানো? আজ থেকে কুড়ি বছর আগে। তখন বিজ্ঞানীরা মাইক্রোর নীচে কিছু ভাবতেই পারছে না। এই নিয়ে আমাকে কম হেনস্থা হতে হয়নি। অবশ্য সেই অভিজ্ঞতা ছিল বলেই আজ এই আবিষ্কারটা সম্ভব হল।'

—বুঝলাম, তারপর?

—এবার আমি আর একটা যন্ত্রের মাধ্যমে যদি ঠিক সেই সেই এলিমেন্টগুলো সেই সেই জায়গায় বসিয়ে দিতে পারি তবে আর একটা ঠিক এমনই আংটি হবে কি না?

ব্যাপারটা খুব জটিল হলেও বুঝতে অসুবিধা হল না। বললাম, 'হ্যাঁ হবে।'

ডক্টর পান বললেন, 'আর একটা ব্যাপার আছে। ওই অণুগুলির মধ্যে বন্ডিং করারও দরকার। তার জন্য যন্ত্রের মধ্যেই বিভিন্ন চাপ তাপ ও অনুঘটকের ব্যবস্থাও আছে। কোথায় কী করতে হবে সে তথ্যও ভরা আছে। এটাকে চতুর্থ-মাত্রা বা ফোর্থ-ডাইমেনশন বলা যেতে পারে। তাহলে?'

—ফোর্থ-ডাইমেনশন ব্যাপারটা তো আগেই শুনেছি।

—সেটা অন্য ব্যাপার। পিওর ফিজিক্স। সেখানে ফোর্থ-ডাইমেনশন হল গিয়ে টাইম। এটা সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। নিউ আইডিয়া।

আমি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম। এত সোজা ব্যাপারটা আর কারও মাথায় আসেনি! এটা যদি সম্ভব তবে তো পৃথিবীর যে-কোনও জিনিসেরই ডুপ্লিকেট করা যেতে পারে! ইনি দেখছি সত্যিই প্রফেসর ক্যালকুলাস!

ডক্টর পান বললেন, 'এই ব্যাপারটাই আমি কাউকে বোঝাতে পারছিলাম না। দীর্ঘ দশ বছর ধরে আমি প্রজেক্ট সাবমিট করেছি আর পাগলের প্রলাপ বলে বার বার সেগুলো রিজেক্টেড হয়েছে। আরে বাবা পিরিয়ডিক টেবিলের একশো বারোটা এলিমেন্টের বাইরে এই মহাবিশ্বে আর কিছু তো নেই। গাছ, মাটি, গাড়ি, ঘোড়া, মানুষ সবই তো ওই একশো বারোর কম্বিনেশন মাত্র। তবে জটিলতা অনেক ছিল। প্রধান জটিলতা ছিল এই পরিবেশ সৃষ্টি, অর্থাৎ বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন, বডিটেম্পো মধ্যেই। সেটাই আমি এত বছর ধরে সল্ভ করলাম।'

—তাহলে আপনি এটাকে প্রকাশ করছেন না কেন?

—করব, করব। আর একটুই বাকি আছে, সেটা হয়ে গেলেই করব। অনেক কথা হল। এবার আমার দেখো আমার পাগলামির ফল।

ডক্টর পান আংটিটা নিয়ে মেশিনটার সামনে গেলেন। সেখানে সোর্স লেখা ড্রয়ারটা টেনে তার মধ্যে আংটিটা রাখলেন। তারপর বেশ কয়েকটা সুইচ অফ-অন করে দিলেন। দু'পাশে রাখা দুটো কমপিউটারকে অন করে দিলেন। মিনিট তিনেক কমপিউটারে কী সব করলেন তারপর আমার আংটিটা ড্রয়ার থেকে বের করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'অ্যানালিসিস হয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রোডাকশনে প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। এটা সবথেকে জটিল। প্রায় এগারোটা বাজল, চলো আমরা লাঞ্চটা তৈরি করি। তারপর লাঞ্চ করে এসে দেখা যাবে কী হল।'

লাঞ্চ বলতে ভাত আর সঙ্গে সিদ্ধ করা কিছু শাকসব্জি। ডক্টর পান বললেন, 'আমার এই দিয়েই চলে যায়। ইয়ংম্যান, তোমার হয়তো অসুবিধা হবে। যাই হোক, এই দিয়েই চালিয়ে নাও। একদিনের ব্যাপার। কাল দুপুরে দূরের আদিবাসী গ্রাম থেকে দু'-তিনজন এখানে আসবে। ওরাই আমার খাবারদাবার ও প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে আসে। বিনিময়ে কিছু টাকা পায়। ওদের সঙ্গে তোমায় পাঠিয়ে দেব।'

আমি বললাম, 'এখান থেকে কত দূর গেলে লোকালয় পাব?'

—সে অনেক দূর। কাল দুপুর নাগাদ রওনা দিলে পরশু সকালে পৌঁছবে। তবে ভয়ের কিছু নেই। ওরা রাস্তাঘাট সব চেনে আর খুব বিশ্বস্ত। তোমার কোনও ক্ষতি হতে দেবে না।

—না, সে ভয় আমি পাচ্ছি না। আর একটা কথা বলুন। এই দুর্গম জায়গায় আপনি এত সব করলেন কী করে?

—সে অনেক কথা। এখানে আসার আগে দিল্লিতে একটা নামকরা রিসার্চ সেন্টারে চাকরি করতাম। কিন্তু আগেই বলেছি যে ওখানে ওরা আমাকে পাগল ভাবত। ফান্ড পেতাম না। তাই রিজাইন করলাম সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে নিজেই কিছু করব। ভাগ্যক্রমে আমার বেশ কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল। নিজে বিয়ে করিনি, তারপর বহু দিন বিদেশে কাটানোয় নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগও কম হয়ে গিয়েছিল। তাই সব সম্পত্তি বেচে দিয়ে এখানে চলে আসি। তার পর দীর্ঘ দশ বছরের চেষ্টায় এই ল্যাব গড়ে তুলি। প্রথমে দুই-তিনজন মাইনে করা লোক ছিল। একে একে তারা চলে যায়। এই বনজঙ্গলে কে আর থাকতে চায় বলো। এখন ওই দূর গাঁয়ের আদিবাসীরাই ভরসা।

লাঞ্চ শেষ করে দু'জন আবার ল্যাবরেটরিতে গেলাম। দেখলাম প্রডাক্ট লেখা ড্রয়ারটা অর্ধেক

খোলা। ড্রয়ারটার মধ্যে একটা আংটি। ডক্টর পানের কথায় এতটাই বিশ্বাস জন্মেছে যে, বিস্মিত হলাম না। হাতে নিয়ে দেখলাম আমার হাতের আংটিটার মতো হুবহু আর একটা আংটি। এমনকী আংটিটায় যে-আঁচড়ের দাগগুলো ছিল সেগুলোও অবিকল, একই রকম।

আমি দুম করে প্রশ্ন করলাম, 'আপনার এই আবিষ্কার মানুষের কী কাজে লাগতে পারে?'

ডক্টর পানকে উত্তেজিত দেখাল, ঘরময় পায়চারি করতে করতে বললেন, 'মানুষের কী উপকারে লাগবে বা লাগবে না সেটা দেখা বিজ্ঞানীর কাজ না। আইনস্টাইন, নাইলস বোর এঁরা পরমাণুর মধ্যে যে-শক্তি লুকিয়ে আছে সেটা বের করে আনার পথ বাতলেছিলেন। সেই আবিষ্কার তো মানুষ মারার কাজেও লাগছে। আবার সেটাই তো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর শক্তির প্রধান উৎস। ডিনামাইট, এক্সপ্লোসিভ আবিষ্কার না হলে পৃথিবীর জনপদের, বিশেষত পাহাড়ি অঞ্চলের এত উন্নতি হত? হত না। আবার এগুলোই মানুষ মারার সবথেকে বড় হাতিয়ার। অত বড় ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে না। আগুন, যা বিজ্ঞানের সর্বপ্রথম আবিষ্কার। আগুন সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে আবার অপব্যবহারে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। ধরো জল, আর এক নাম জীবন। কিন্তু জল কি জীবননাশ করে না?' এতক্ষণ একনাগাড়ে বলে ডক্টর পান শান্ত হলেন। চেয়ারটায় হেলান দিয়ে বসে বললেন, 'উপকারের কথাই যদি বলো তবে এর সম্ভবনা বিশাল। পৃথিবীর ভবিষ্যতের প্রোডাকশন সিস্টেমটাই বদলে যাবে। তখন বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার জন্য হাজারো রকমের কল-কারখানার দরকার হবে না। আরে বাবা সব কিছুর মূলেই তো ওই একশো বারোটা এলিমেন্ট। একটা মেশিনে এই একশো বারোটা এলিমেন্ট ভরে দিয়ে ঠিকঠাক চালাতে পারলেই তো যে কোনও কিছু কপি করা সম্ভব।'

আমার মুখ দিয়ে হট করে বেরিয়ে গেল, 'মানুষও?'

ডক্টর পান কোনও উত্তর দিলেন না, কোনও গভীর চিন্তায় ডুবে আছেন বলে মনে হচ্ছে।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম, 'মানুষও?'

ডক্টর পান আমার মুখের দিকে তাকালেন। এত গভীর দৃষ্টি আমি আগে কখনও দেখিনি। থেমে থেমে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ মানুষও। তার মানে প্রাণ। মানে পঞ্চম মাত্রা, ফিফ্‌থ ডাইমেনশন! এটা আমার আবিষ্কারের পরের ধাপ। তিন থেকে শুরু করে চার, পাঁচ। থিওরিটিক্যালি আমি কনফিডেন্ট যে এটা সম্ভব। কিন্তু...'

—কিন্তু...কী?

—কিন্তু এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়ে ওঠনি। যদি রাজি থাকো তবে তুমিই আমাকে সাহায্য করতে পারো। আমি কথা দিচ্ছি তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।

ডক্টর পানের কথা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলাম। তাও বললাম, 'আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন ঠিক কী করতে চান। তাহলে রাজি হতেও পারি।'

ডক্টর পান বললেন, 'ঠিক যেভাবে আংটিটার কপি করলাম সেভাবে তোমারও কপি করতে পারি। এত পর্যন্ত কোনও সমস্যা নেই। প্রথমে তোমার ফুল বডি স্ক্যান করতে হবে। তারপর এলিমেন্টগুলিকে সঠিক জায়গায় প্লেস করে বায়োকেমিক্যাল রিঅ্যাকশন করাতে হবে। কিন্তু সমস্যাটা তার পরের ধাপে, সেটা এখনও করা হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ প্রাণ প্রতিষ্ঠা। পৃথিবীতে প্রাণ কী তা কেউ এখনও সঠিকভাবে বলতে পারেনি। কিন্তু যতটা জানা যায় ও আমি যতটা চর্চা করেছি তাতে আমি নিশ্চিত এটা সম্ভব। সেই পরের ধাপটা হল তোমার যত রকমের ফিলিং সেগুলোকে প্রথমে স্টোর করতে হবে। তারপর সেই ফিলিংগুলো শক্ থেরাপির মাধ্যমে ডুপ্লিকেট-এর মস্তিষ্কে ও বিভিন্ন ভাইটাল পার্টসে চালান করতে হবে। সেটা করতে আমার মেশিন তৈরি। কিন্তু ভলেন্টিয়ার পাচ্ছি না বলে এক্সপেরিমেন্টটা করা হয়ে ওঠেনি।'

—আপনি স্ক্যান করেই আমাকে ছেড়ে দেবেন। জটিলতাটা তো পরের স্তরে। সুতরাং ভয়ের কিছু দেখছি না। আমি রাজি। তবে সমস্যাটা অন্য জায়গায়। আমার ডুপ্লিকেট চিন্তা করে বেশ রোমাঞ্চিত লাগছে। এ তো আর আমার যমজ ভাই না, একেবারে আমার আমি। তাই ভাবছি যে তার কী গতি হবে এই সমাজে।

ডক্টর পান চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, 'আঃ! সেই একই প্রশ্ন! বিজ্ঞানের সাধনা করতে হলে তাই করো, নয়তো কোরো না! কী করলে কী হবে অত ভাবলে বিজ্ঞানের সাধনা হয় না।' ডক্টর পান আবার চেয়ারে বসে পড়লেন। টেবিলে রাখা দুই হাতের মাঝে মাথা গুঁজে জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। মিনিটখানেক নিস্তব্ধতার পরে আবার ডক্টর পানের গলা শোনা গেল। বেশ ভেঙে পড়েছেন। বললেন, 'আমি জানি আমার এই এক্সপেরিমেন্টটা আর করা হয়ে উঠবে না। আই অ্যাম এ ক্যান্সার পেশেন্ট। আর মাত্র কয়েক মাস বাঁচব। চাইলে আদিবাসী লোকগুলোকে ভুল বুঝিয়ে, পয়সার লোভ দেখিয়ে অনেক আগেই আমি এটা করতে পারতাম। কিন্তু ছলনা করতে শিখিনি, কোনওদিন করবও না।' একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ফরগিভ মি ইয়ংম্যান। এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়াটা ঠিক হয়নি। ফরগিভ মি। ফরগিভ মি।'

আমি বললাম, 'ডক্টর, আমি রাজি।'

ডক্টর পান আস্তে আস্তে মুখ তুললেন। দুঃখ, অনুশোচনায় ভরা মুখটা আস্তে আস্তে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখের কোণে জ্বলজ্বল করে উঠল দু'ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। উঠে দাঁড়িয়ে আমার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিসিয়ে বললেন, 'শিওর? আর ইউ শিওর?'

—ইয়েস, আই হ্যাভ ডিসাইডেড।

—তাহলে আর সময় নষ্ট করা যাবে না। কালকে তোমাকে ফেরত পাঠাব কথা দিয়েছি। সুতরাং এখনই শুরু করা যাক। তোমার মেন্টাল ও ফিজিক্যাল অ্যানালিসিসেই কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবে। তারপর রাতটা পাওয়া যাবে প্রোডাকশনের জন্য। কাম, কাম মাই বয়।

ডক্টর পান মেশিনের এক কোনায় গিয়ে একটি সুইচে চাপ দিলেন। একটা চেয়ার সামনে বেরিয়ে এল। আমাকে চেয়ারটায় বসতে নির্দেশ দিলেন। বললেন, 'প্রথমে তোমার মেন্টাল অ্যানালিসিসটা করে নিই। আমি তোমাকে কিছু দুঃখের, আনন্দের, শ্রদ্ধার, ঘৃণার সিচুয়েশন বলব। ওগুলোর ওপর বেস করে তুমি তোমার অতীতের নানা স্মৃতি মনে আনবে। আমার যন্ত্র সেইমতো বিভিন্ন সিচুয়েশনে তোমার ব্রেনওয়েভ ও নার্ভ অ্যাকটিভিটি রেকর্ড করবে।' এই বলতে বলতে ডক্টর পান আমার মাথার চারদিকে, বুকে, হাতে বিভিন্ন সেন্সর লাগিয়ে দিলেন। কয়েকটা সুইচ অন করতেই বেশ কয়েকটা বড় বড় টেপের স্পুল এক সঙ্গে ঘুরতে শুরু করল। তারপর বললেন, 'আর ইউ রেডি?'

—ইয়েস রেডি।

—গুড। এবার ভাবো তোমার বাবার কথা, মা'র কথা, প্রিয়জনের কথা। মামার কথা, কাকার কথা, ভাবো ভাবো। যাদের শ্রদ্ধা করো তাদের সবার কথা ভাবো।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'এইবার ভাবো দুঃখের কথা। জীবনে বড় ধরনের যে ক'টি দুঃখ পেয়েছ সেগুলির কথা।'

আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'এইবার ভাবো আনন্দের কথা। তোমার পরীক্ষায় পাস করার কথা। চাকরি পাওয়ার কথা। ভাই-বোনদের কথা, ভাবো ভাবো।' প্রায় মিনিট তিরিশ-চল্লিশ এভাবে চলার পর ডক্টর পান মেশিন বন্ধ করলেন। সেন্সরগুলো খুলে দিয়ে আমাকে চেয়ার থেকে উঠতে বললেন। তারপর বাঁদিকের সোর্স লেখা ড্রয়ারটা খুললেন। এইবার খেয়াল করলাম ড্রয়ারটা এতটাই লম্বা ও বড় যে দুইজন লোক পাশাপাশি শুয়ে থাকতে পারে। ডক্টর পানের ইশারায় আমি ড্রয়ারটার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ডক্টর পান আমার শরীরটা কয়েকটা বেল্ট দিয়ে বেঁধে দিলেন যাতে নড়তে-চড়তে না পারি। হাতে একটা সুইচ-এর মতো কিছু দিয়ে বললেন, 'ভয় পেলে বা অসুবিধা হলে প্রেস করতে, তাহলে আমাকে উনি বাইরে বের করে আনবেন। আশ্বাস দিলেন যে

> পিছন ফিরতে দেখলাম একজন বৃদ্ধ লোক। ফরসা মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি। নাইট সুটের মতো একটা পোশাক পরা। ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে ব্যাকব্রাশ করা লম্বা চুল। বৃদ্ধের দিকে ফিরে নিজের নাম বললাম।

ভয়ের কিছু নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই স্ক্যান কমপ্লিট হয়ে যাবে। তারপর আমাকে উনি বের করে আনবেন।' ড্রয়ারটা বন্ধ হয়ে গেল।

কথামতো ডক্টর পান ঘণ্টাখানেক পরে ড্রয়ার খুললেন। আমি বেরিয়ে আসলাম। সত্যি বলতে ডক্টর পানের কথা এতটাই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে যে ভয় একেবারেই পাইনি। কিন্তু মাথার মধ্যে চিন্তাটা একেবারেই যাচ্ছে না। ডুপ্লিকেট যদি সত্যিই হবে তবে কী হবে। যদিও সেটা প্রকাশ করার আর সাহস নেই। বিকেল হয়ে এসেছে। ডক্টর পান বললেন, 'চলো কিছুক্ষণ বাইরে হাঁটাহাঁটি করে ফ্রেশ হয়ে নেওয়া যাক। তারপর সন্ধ্যা নামলে প্রোডাকশন স্টার্ট করে দেওয়া যাবে। রাতে যখন তুমি ঘুমাবে তখন তোমারই আবার পুনর্জন্ম হবে।' কথাটা বলতে বলতে ডক্টর পানের গলাটা একটু কেঁপে গেল। আমারও বুকের মধ্যটা কেঁপে উঠল।

তারপর সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ ডক্টর পান যন্ত্রটা চালু করে দিলেন। আমরা দু'জনে ঘরের সব আলো বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ডক্টর পান ঘরের লোহার দরজাটা বাইরে থেকে ভাল করে বন্ধ করে দিলেন। আমাদের দু'জনের কারও মুখে কোনও কথা নেই। পাশাপাশি থেকেও যেন বহু যোজন দূরে। যন্ত্রচালিতের মতো ডক্টর পান রাতের খাবার বানালেন। দুপুরের খাবারের মতো, একই মেনু। দু'জনে খেয়ে শুয়ে পড়লাম। রাতে উত্তেজনায় কারওই ঘুম হয়েছে বলে মনে হল না। ভোর না হতেই ডক্টর পান স্নান করে এসে ব্রেকফাস্ট তৈরি করতে লাগলেন। আমিও সেই ফাঁকে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে ডক্টর পান বললেন, 'আজকের তারিখটা মনে রেখো। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কারটা আজই প্রমাণ হতে যাচ্ছে। এতক্ষণে সবকিছু হয়েই গিয়েছে। এখন শুধু দরজা খোলার অপেক্ষায়। তোমার ডুপ্লিকেট। শুধু চেহারায় নয়। দুঃখ, আনন্দ, রাগ, শোক, তাপ সব নিখুঁত তোমার মতো। অবশ্য কালকের মেন্টাল অ্যানালিসিসের সময় এক্সপ্রেশনগুলো যদি সব ঠিকঠাক হয়ে থাকে।'

আমি বললাম, 'আর যদি ঠিকঠাক না হয়ে থাকে?'

ডক্টর পান চমকে উঠলেন। হাত থেকে রুটির টুকরোটা ছিটকে পড়ে গেল।

—তার মানে? কী বলতে চাও কী?

আমি বললাম, 'সত্যি কথাটাই বলি। অনেক চেষ্টা করেও হয়তো আমার চিন্তার স্রোতটা ঠিকঠাক বইছিল না। প্রথমে ঠিকই ছিল। তারপর আপনি যখন আমার কাকার প্রসঙ্গ তুললেন তখন সব ওলটপালট হয়ে গেল। কাকার ওপর আমার ভয়ানক রাগ। কাকা বাবাকে ঠকিয়ে আমাদের সব কিছু হাতিয়ে নিয়েছিল। সেই কারণেই বাবার সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে যায়। আমায় পড়াশুনো ছেড়ে এয়ারফোর্সে জয়েন করতে হয়। আপনি যখন আনন্দের কথা, সফলতার কথা বলছিলেন তখনও আমার কাকার মুখটাই চোখের সামনে ভাসছিল। ইচ্ছে করছিল সামনে পেলে টুঁটি টিপে ধরি। তারপর যখন বোনের কথা বললেন তখনও আনন্দের বদলে

দুঃখে মনটা ভরে গেল। কারণ গতকালই ওর মাধ্যমিকের ফল প্রকাশ পাওয়ার কথা ছিল। আমাকে খবর দিতে না পারায় দুঃখে নিশ্চয়ই কান্নাকাটি করছে।'

ডক্টর পান সামনের টেবিলটাকে দুই হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে বাইরে দৌড়ালেন। টেবিলের ওপরে রাখা কাপ-ডিশগুলো মেঝেতে পড়ে ঝনঝন শব্দে ভেঙে গেল। আমিও পিছনে পিছনে ছুটলাম। ডক্টর পান পাগলের মতো চিৎকার করতে করতে ল্যাবরেটরির দিকে দৌড়চ্ছেন। কয়েকটা কথা কানে এল, 'অনর্থ হয়ে যাবে! আমার আবিষ্কার জন্মাবে অসম্ভব ক্রোধ, ঘৃণা, হতাশা নিয়ে! অনর্থ হয়ে যাবে!' এই বলতে বলতে ল্যাবরেটরির দরজাটা এক টানে খুলে ফেললেন। মধ্যে থেকে হলকা হাওয়ার সঙ্গে ধোঁয়া ও একটা ঝাঁঝালো গন্ধ বেরিয়ে আসল। অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। যেটুকু দেখলাম তাতে পুরো ঘরটা আগুনে ঝলসে গিয়েছে। টেবিলের ওপর রাখা মোটা নোটবুকের পৃষ্ঠাগুলো কুচি কুচি করে ছেড়া। সারা মেঝেতে ছড়িয়ে আছে অ্যাসিড, কেমিক্যাল, কাচ ও কাগজের টুকরো। সবকটা যন্ত্রপাতি ভাঙা। পিছনের মূল যন্ত্রটার ওপর ভারী কিছু দিয়ে কেউ প্রবল আঘাত করেছে। যন্ত্রটা আগুনে পুড়ে ঝলসে গিয়েছে। টেবিলটার ওপাশে কে যেন উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। শরীরটা আগুনে ঝলসানো। হঠাৎ ঘরের মাঝে দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। আমি ও ডক্টর পান দৌড়ে নিরাপদ দূরত্বে পিছিয়ে এলাম।

ডক্টর পান বললেন, 'দরজা বন্ধ থাকায় অক্সিজেন না পেয়ে আগুনটা নিভে গিয়েছিল। হয়তো কোথাও ধিকধিক করে জ্বলছিল।'

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'চলুন কিছু একটা করে আগুন নেভানোর ব্যবস্থা করি।'

ডক্টর পানকে অদ্ভুত শান্ত দেখাল। বললেন, 'তার আর কোনও উপায় নেই। ঘরটায়, বিশেষত যন্ত্রটার মধ্যে এত রকমের কেমিক্যাল ও দাহ্য পদার্থ আছে যে আগুনটা বিশাল আকার নেবে। চলো আমরা আরও কিছুটা পিছিয়ে যাই।'

আমাদের চোখের সামনে জতুগৃহের মতো পুরো বাড়িটাই দাউ-দাউ করে জ্বলতে থাকল। উপরের চাল, পাশের দেওয়াল ধসে পড়ল। প্রায় ঘণ্টাখানেক এভাবে চলার পর একটা নিষ্প্রভ পাথরের স্তূপ ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকল না। ডক্টর পানের দিকে তাকালাম। দেখলাম ঠোঁটের কোণে হাসি। ভাবলাম হঠাৎ শোকে হয়তো পাগল হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝলাম তা না। ডক্টর পানকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'এত বড় একটা ঘটনার পরেও আপনি হাসছেন? একটুও দুঃখ হচ্ছে না!'

ডক্টর পান বললেন, 'দুঃখ করে কী লাভ! একটা চেষ্টা করেছিলাম। বিজ্ঞানের সব চেষ্টা তো সফল হয় না। সাকসেস ফেলিওর দুটোকেই সমানভাবে নিতে হবে। বি প্র্যাকটিকাল।' একটু থেমে স্বগতোক্তি করলেন, 'শুধু একটা ছোট ভুলের জন্য সব কিছু নষ্ট হয়ে গেল।'

আমি অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হতে বললাম, 'ভুলটা তো আমারই। আমি যদি...'

—না না, তোমার কোনও দোষ নেই। তুমি তো ইচ্ছা করে কিছু করোনি। বরং আমারই দোষ যে আমি বড় বেশি তাড়াহুড়ো করে ফেলেছিলাম। তোমাকে সব কিছু আরও ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। আর ভুলটা হল আমার নোটবইটা ওই রাতে ঘরে এনে রাখা উচিত ছিল। তাহলে নতুন করে কেউ আর একবার চেষ্টা করতে পারত।

—কিন্তু ফেলিওর বলছেন কেন? আপনি তো সফল হয়েছিলেন। কিন্তু...

আমাকে থামিয়ে ডক্টর পান বললেন, 'ইফ, বাট এগুলোর পৃথিবীতে কোনও দাম নেই। পিপল ওয়ান্ট টু সি দা রেজাল্ট। এনি ওয়ে খোদার ওপর খোদকারি একটা বড় চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমাকেই পিছু হটতে হল। এটাই শেষ কথা।'

বেস-এ ফিরব। তারপর বাড়ি। কিন্তু রওনা হবার মুহূর্তটায় মনটা ভেঙে গেল। ডক্টর পানকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, 'এনি মেসেজ ডক্টর, ফর মি অর সোসাইটি?'

ডক্টর পান আমার মাথায় স্নেহের হাত রাখলেন। বললেন, 'এটাই শুধু বলব, থিঙ্ক বিগ ইন লাইফ অ্যান্ড অলওয়েজ় বি পজ়িটিভ। আর একটা কথা, যদি উপযুক্ত প্ল্যাটফর্ম পাও তবে আমার এই আবিষ্কারের কথা পৃথিবীকে জানিয়ে দিতে পারো। বেশির ভাগ মানুষ গল্পকথা ভাববে। কিন্তু আমার মতো ক্ষ্যাপা দু'-চারজন কি থাকবে না যারা তিনে থেমে থাকতে চায় না? তিন-চার-পাঁচ করে সভ্যতাকে তারাই এগিয়ে নিয়ে যাবে।'

অঙ্কন: সুমন কবিরাজ

সুব্রত হালদার

জন্ম ১৯৬১। বহুজাতিক সংস্থায় ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার। শখ: গল্প ও কবিতা লেখা, সফ্‌টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট। সামাজিক কাজে আগ্রহী। আনন্দমেলা-য় প্রথম গল্প (২০০৩) প্রকাশের পর দেশ সহ বহু পত্রিকায় গল্প প্রকাশিত হয়েছে।